একুশটা মেয়ে

একুশটা মেয়ে

শ্রীবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড্, কলিকাতা ৭

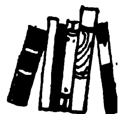
প্রথম সংস্করণ
৭ই শ্রাবণ, ১৩৬৩

এক টাকা
আট আনা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
২৭।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬



উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু



ভূমিকা

এই বইয়ের অনেকগুলো কবিতা ইতিপূর্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কতকগুলো আমার প্রথম কবিতার বই 'এলোমেলো' থেকে নেওয়া।

অন্য কিছু বলার নেই। কিছু কথা হয়তো কবিতাগুলোই বলতে পারবে।

রথযাত্রা, ১৩৬৩

গ্রন্থকার

···একটা ফোঁটা উর্বশী, আর অর্ধ ফোঁটা তিলোত্তমা,
একটু শকুন্তলার গুঁড়ো, একটু নয়নবারি জমা—
একটু ছেঁড়া কাঁচলি আর একটা ছটাক মিষ্টি হাসি,
গহন রাতের ছাতে শোনা অনেক দিনের আগের বাঁশী
জ্যোৎস্না দিয়ে সে সব বাটা, তাইতে গড়া কুহকিনী,
কুহকিনী, চিনি, চিনি·

অকারণ

মানুষের মেধা আছে, বুদ্ধি আছে, দীপ্তি আছে, তার তাগাদায় অহর্নিশি মানুষ কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করবার জন্যে ব্যস্ত। ঐ প্রচেষ্টার পেছনে মানুষের যত জ্ঞান-বিজ্ঞান-অজ্ঞান পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে প্রতিদিন। কি? কে? কেন? কবে? কোথায়? ...এই হল আমাদের প্রশ্ন। কারণ জানবার জন্যে সব সময় আকুল হয়ে থাকি আমরা···

অথচ চোখের সুমুখ দিয়ে চলছে রূপের মিছিল, মানুষের বুদ্ধি তার নাগাল পায় না। সমস্ত বিশ্বচরাচরে জাগছে শুধু অকারণের হাতছানি···

পুরানো গাছের কাণ্ডের 'পরে
ছোট্ট উঠেছে শাখা,
কাণ্ড দেখিয়া আমি ত' হাসিয়া মরি,—
কে ওরে ডেকেছে, কি কারণ তরে
বেহায়ার মত থাকা ?
বিশ্ব-ভুবন হাসে বিদ্রূপ করি···

প্রাচীন বিটপী, আছে বহুদিন—
বহু সম্পদ আছে,
লতায় পাতায় নিঃস্ব নহেকো মোটে :
প্রয়োজন নাই, তবু কেন ঋণ
করা ও শাখার কাছে,—
প্রবীণ বয়সে রং কেন মাখা ঠোঁটে ?

বিশ্রামহারা ক'দিন বৃষ্টি
দিবস রাত্রি ধরি,
সেই ফাঁকে কবে দেখা হল দুজনাতে—
মেঘের শঙ্খে কে শুভদৃষ্টি
ঘটালো—কে নিল বরি
অত্যুচ্চরে নেহাত তুচ্ছ সাথে ?

হেসে মরে যাই নাহিকো লজ্জা—
নবীন চিকণ পাতা
ইহার মধ্যে বাহির হয়েছে ফুটে,
বৃদ্ধ পরেছে শিশুর সজ্জা—
ফুল-পাতা-আঁকা ছাতা,
নয়ন হানিছে বুড়ার মাথায় উঠে ।

অকারণ

সাত বছরের কন্যা আমার
বলে, কেন ওরে রাখা,
লয়ে যাব ছিঁড়ে আমার খেলার ঘরে ;
ও যে প্রজাপতি, চিকণ পাতার
কখন মেলিয়া পাখা,
উড়ে চলে যাবে কোথায় দেশান্তরে ।

বারে বারে হায় যুগ যুগ ধরে
এমনি উড়িয়া যায়,
দু'দিন থাকিয়া দু'দিনের প্রজাপতি !
শুধু রংটুকু কাঁপে পাখা' পরে,
ছোঁয়াটুকু লাগে গায়,
শুধু ঝরা ফুল চরণে জানায় নতি···

আজ আছে কাল চিহ্ন রবেনা,
হবে নাকো কানাকানি,
বিশ্বভুবনে শুধাবেনা কেহ কিছু ঃ
মঙ্গল ঘট পাতিয়া ক'বে না
কেহ বিদায়ের বাণী,
যাবার বেলায় নয়ন করিয়া নিচু···

শুধাই কারণ, কেন অকারণ,
কেন ও ছোট্ট শাখা,
কেন মিছামিছি অকরুণ অপচয় ?
মনে হল যেন অতোটুকু ধন
গোপনে বাঁধিয়া রাখা,
কালের আঁচলে, ও চিরদিনের জয়···

বড়োসাহেব

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বড়োসাহেব—এই সেদিন তার বিয়ে হয়েছে। এই সবে সেদিন—আসছে মঙ্গলবারে এক মাস পূর্ণ হবে।

উদ্দাম দেওয়া-নেওয়ার তরঙ্গক্ষুব্ধ দিনরাত্রি নিজের উচ্ছ্বাসে নিজেই এগিয়ে চলেছে অবিশ্রাম···

প্রকাণ্ড অফিসের সুযোগ্য বড়োসাহেব—দিনের বেলা দাপটের চোটে থরহরি কম্প। কর্মচারীদের ভয়ের অন্ত নেই, কার কখন জরিমানা হবে, কার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে হঠাৎ···

ডেসপ্যাচ্ ডিপার্টমেণ্টের সুশীল, তার মাথার ওপরে বিপদের কালোমেঘ ঘনিয়ে এসেছে। বড়োসাহেবের মত তারও নতুন বিয়ে—সে সেদিন বারোটার সময় নিজের সিটে বসে টেবিলের ওপরে মাথা রেখে খুব ঘুমিয়ে পড়েছিল, তা নাকি বড়োসাহেবের নজরে পড়ে যায়। কি করবে সুশীল, রাত্তিরে ঘুম না হলে লোকের দোষ কি? রক্ত মাংসের শরীর তো?

অবৈধ ঘুমের জন্যে বড়োসাহেব নাকি সুশীলকে রিটিন্ ওয়ারনিং দিয়েছে।···অফিসসুদ্ধ লোক জুজুর ভয়ে অস্থির হয়ে থাকে, এই তো হল দিনের বেলার কথা। কিন্তু রাত্তিরে?···

তুমি যখন সাহেব সেজে অফিস করো বসে
গোঁফকামানো মুখখানাকে বিষম করে ভারি,
ভয়ে আকুল কেরানীকুল কলম হানে কসে
কড়র-মড়র করছে এসে দশটা মাড়োয়ারী ;
শুধাই তোমায় বড়োসাহেব, জবাবটা কি পাবো,
বলবে আমায় রাতের কথা একটু মনে ভাবো ?

রাতের বেলা, ছাতের পরে মোদের স্বপ্নলোক,
সুখের মোহে অবশ তনু, মুখে হারায় বাণী—
আবেশ আকুল মত্ত হৃদয়, স্বপন-ভরা চোখ,
সারাটি রাত নিমেষ হারা···বক্ষে টানাটানি—
হ্যাঁগো মশাই বড়োসাহেব, একটি মিনিট তরে,
বলবে আমায়, রাতের কথা একটু মনে পড়ে ?

যেথায় তুমি বড়োসাহেব, ধূর্তরাজের সেরা,
যেথায় শুধু অঙ্ককষা, কেবল টাকা গোনা ;
সেথায় তুমি পাঁচিল দিয়ে একেবারেই ঘেরা,
আমার চুড়ির কান্না জানি, যায় না সেথা শোনা ঃ
সেথায় তোমার কাছে যেতে পথ পাবো না জানি,
বড়োসাহেব, আমি তোমার গানের মহারাণী ।

যখন তুমি সাহেব সেজে অফিস নিয়ে থাকো,
বলতে পারো, হেনা তখন বাড়ীতে কি করে ?
সারা রাতের নিদ্রাহারা নয়ন মানে নাকো
ঘুমিয়ে পড়ে বালিসটাকে বক্ষে চেপে ধরে ?
এটা না হয় ঠিক হয়েছে রইল কিন্তু বাকি,
কেউ জানে না, দেখবো কেমন বলতে পারো নাকি !

স্বপন পারাবারের তরী, তারই বুকে বসে,
হেনা তখন পাড়ি জমায় রাতের স্বপ্নলোকে,
তুমি যখন হাঁপিয়ে ওঠো অঙ্ক কষে কষে—
হেনা তখন চুমু ছড়ায় তোমার মুখে চোখে।
সত্যি বোলো বড়োসাহেব, অঙ্কে হয় না ভুল—
পড়ে না কি মুখের 'পরে আকুল এলো চুল?
বড়ো আমার ইচ্ছে করে, একটি দিনের তরে
স্বপন-মোহে-অন্ধ-নয়ন অফিসটাতে যাই,
তারপরেতে রাতের মত হঠাৎ বুকে ধরে,
ঘুচিয়ে দি সব হিসেব করা, অঙ্ক কষা ছাই ;
কেরানীরা বুঝবে সবাই বড়োসাহেবেরো,
বড়োসাহেব ঘরে আছেন, কঠিন কেমনতরো।

পাশাপাশি

এই গল্প-কবিতা ১৯৩৪ সালের বিহার ভূমিকম্পের একটা সত্য ঘটনা অবলম্বন করে লেখা। কিন্তু হয়তো একথাটা না বললেও চলতো…

একুশটা মেয়ে

পাশাপাশি হায় তুইখানি বাড়ী
বহুদিন ধরে আছে,
ঝড়ে উড়ে পড়ে ও-বাড়ীর শাড়ী
এদের বাড়ীর গাছে।
এ-বাড়ীর ফোটা ফুল থেকে উঠে
ও বাড়ীতে যায় মৌমাছি ছুটে,
ফুটি-ফুটি ফুল ওদের বাড়ীতে
যদি এতটুকু ফোটে,
ঝরিয়া ঝরিয়া শিউলি বকুল
যখন ধূলায় লোটে।

মাঝখানে শুধু সরু পথটুক্
অতটুকু ব্যবধান,
না হ'লে ওপারে ধুকধুক বুক
এপারে উতলা প্রাণ…
ওবাড়ীর কথা হেথা শোনা যায়,
ওদের কুকুর এবাড়ী ঝিমায়,
এদের বেরাল মাছ চুরি করে
ওবাড়ীতে গিয়ে খায়,
ওবাড়ীর কাঁটা বেছে বেছে ফোটে
এদের বাড়ীর পায়।

ওবাড়ীর মেয়ে বাসে চ'ড়ে গিয়ে
ইণ্টার-কলা পড়ে,
এবাড়ীর ছেলে পাশ করে বি-এ,
আকাশে সৌধ গড়ে ঃ
মেলে বারে বারে যখন তখন,
হেথা ছুটি আঁখি হোথা ছু'নয়ন,
থেকে থেকে ফোটে সরম-রক্ত
মুখ 'পরে অঙ্কন—
আসে বারে বারে, আঁখি নিচু করে
ফিরে চাহিবার ক্ষণ।

ছু'বাড়ীতে যায় ভাগের গাড়ীতে
সিনেমা কি থিয়েটারে,
এবাড়ী শ্রেষ্ঠ সেমিজে শাড়ীতে
ওবাড়ী অলঙ্কারে :
ওবাড়ী মাথায় মেখেছে গন্ধ,
এবাড়ী কেবল নয়নানন্দ—
নায়িকার ব্যথা ছু'বাড়ীতে বোঝে,
ছু'বাড়ীতে ব্যথা পায় ;
ওবাড়ীর 'রাহা' বলে আহা আহা··
এবাড়ীর 'রায়' হায় !

গ্র্যাজুয়েট বসে সিগারেট খায়,
　　ইণ্টার মোজা বোনে,
দু'জনাতে ওরা ভাবে দু'জনায়
　　দু'জনাতে জানে মনে ;
ইণ্টার তার গানের খাতায়,
লিখে রাখে যাহা গ্র্যাজুয়েট গায়,
গ্র্যাজুয়েট তার শিশে 'মিস্' করে
　　ও-বাড়ীর সাহানায়—
আবার কখন শোনা যাবে গান
　　কান পেতে পথ চায় !

বাণীর বয়স আঠারো হইবে
　　বেণু দশ কম ত্রিশ,
কুড়ি আঠারোরে কেমনে সহিবে—
　　আঠারো, কুড়ির বিষ ?...
বেণু মনে ভাবে চাহিব না আর,
বাণী 'স্ক্রীন' টেনে দেয় জানালার,
কিন্তু হৃদয়ে 'জেনেভার' সভা
　　কেবলি মাগিছে 'পীস্'—
তাই বারে বারে আঁখি মেলা-মেলি
　　তাই বারে বারে 'মিস্'।

বেণুদের বাড়ী গিয়াছে চেঞ্জে
বেণু একেলাই আছে,
বাণীর দাদা সে ময়ূরভঞ্জে
গেছে ফুটবল ম্যাচে।
মা তো দু'দিনের তরে গেছে চলে
মাসিমার কাছে, অসুস্থ বলে,
বউদি' ঘুমায় সূতিকা আগারে
তৃতীয় খোকার ছলে—
নাচে বার বার অভিসার তৃষা
ইণ্টার হৃদি তলে।

শীতের নিঝুম মেঘল দুপুর,
রবি গুণ্ঠন ঘুমে ;
আলিসাতে বসি' কপোতী বিধুর
কপোত চঞ্চু চুমে—
দূরে তরুশিরে কোথা ঘুঘু ডাকে,
জীর্ণ সে পাতা ঝরে কোন শাখে,
কোথা কে গাহিছে বেদনা রাগিণী,
বৌদির নাসা হাঁকে—
বাণী খুঁজে মরে, এঘরে ওঘরে
যদি কেহ জেগে থাকে।

সরুপথ যেন বরষার নদী,—
কঠিন প্রয়াস করি',
সাহসিকা হায় পার হল যদি
ঘন নিঃশ্বাসে ভরি' ;
স্বেদজলে ভাসে বক্ষ-কমল,
ক্ষীণ তনুখানি কাঁপে অবিরল,
দক্ষিণ আঁখি থাকি থাকি কাঁপে
অশুভ সূচনা করি,
পায়ের তলায় কাঁপে কেন ভূমি
বারবার থরথরি ?

চৌত্রিশ সালে সেদিনটা কালো
পনেরোই জানুয়ারী,
পাতালের নাগ মাথা বদলালো
বিপদ ঘটালো ভারি।
ভূমির প্রবল কম্পে বিহারে,
কি ভীষণ লীলা কে বোঝাতে পারে,
স্রোতের মতন রক্ত বহিল,
কত গেল পরপারে—
কত পশু পাখী, শিশু নারী কত—
কত চিকিৎসাগারে।

বাড়ী প'ল ভেঙে আলিঙ্গনেতে
বাণীর বেণুর 'পরে,
ঐ সবে ওরা দুটি হৃদয়েতে
ঠেকেছে প্রলয় ঝড়ে ;
একটি নিমেষ বুকে ছিল বুক,
এক নিমেষের ধুক ধুক ধুক,
একবার বুঝি চেয়েছিল মুখে
পরশিয়া নিতে মুখ ;
একটি পলকে চোখে চোখে বুঝি
চেয়েছিল এতটুক।

মৃত সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া
শঙ্কর বুঝি নাচে,
ভূধর, সাগর, পৃথ্বীর হিয়া
শঙ্কা মরণ যাচে !
ভয়ঙ্করের চরণের তলে,
বসুধা বুঝিবা ফেটে যাবে গ'লে,
হিমগিরি বুঝি সাগরে লুকাবে,
সাগর শুকাবে পলে—
ভয়ঙ্কর সে নাচে শঙ্কর,
সতী বিচ্ছেদে জ্বলে।

পাশাপাশি হায় দুইখানি বাড়ী
ভাঙিয়া পড়িয়া আছে,
ঐ শুয়ে আছে নিষ্প্রাণ নারী
বেণুর বুকের কাছে ঃ
ঐ সবে ওরা মুখে মুখ দিয়ে
পরেছে মরণে চুম্বন নিয়ে,
সুরভি-কুসুম-মালিকার মত
দুর্লভে প্রণমিয়ে—
ঐ বেণু মুখে জাগিয়াছে বাণী
অনল রন্ধ্র দিয়ে।

পিছন-তাড়না

বেয়াল্লিশ বছর বয়সে চুলে পাক ধরে গেল। সমবয়সীরা, যাদের মাথায় পাকা চুল ছিল, তাঁরা আমাকে সহজভাবে এবং বোধহয় কিছু আনন্দ নিয়েই গ্রহণ করলেন। ভাবখানা যেন, এই তো ভালো, এই তো শোভন ও সুন্দর। এখন কি আমাদের পাকা চুল না হলে মানায় ?

আমাদের সময়ে কুন্তলকলার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। মাথার মধ্যে দক্ষিণে, বামে, কিম্বা মধ্যিখানে সিঁথি কাটতেন সবাই। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমি আবিষ্কার করে ফেললুম, আমার আশপাশের তরুণরা ব্যাকব্রাশ করে ফেলেছে। তারপর একদিন আমিও সিঁথি মুছে ফেলে ব্যাকব্রাশ করে ফেললুম।

খুব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে লাগলেন বন্ধুরা। বললেন, আমি নির্লজ্জ, শিং ভেঙে বাছুরের দলে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছি। দু' একজন গম্ভীর মুখে ভয় প্রকাশ করলেন—কে জানে এর পরে আরও গুরুতর কিছু যদি করে বসি আমি ? একজন রূপ দিয়ে বললেন, গত যৌবনের দিকে অত চেঁচিয়ে তাকাবার কি প্রয়োজন আছে ? তাছাড়া কি লাভ হবে ও-রকম বেহায়ামি করলে—যৌবন আবার ফিরে আসবে কি ?

অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম বন্ধুদের যে, ওঁদের ধারণা ভুল—আমি ব্যাকব্রাশ করেছি অন্য কারণে, গত-যৌবনের কথা একটুও মনে নেই আমার। কিন্তু আমার কোন কথাই শুনতে চাইলেন না বন্ধুরা…

তারপর এলো কবিতা :

পিছন-তাড়না করেছি আমার চুলে ;
বেয়াল্লিশের রুপোর নালিশ ভুলে,
চিরুণী বুরুশে, নবারুণ আলো দিয়ে,
পালিশ করেছি অপরাহ্নের ফুলে।

বন্ধুকে বলি, বুর্জোয়া ছিল রীতি
আমাদের কালে কুন্তল-কলাচারে,
দক্ষিণে বামে, কিম্বা মধ্যে সিঁথি—
বণ্টন-নীতি ক্লিষ্ট তাহার ভারে।

মাথার উপরে সাম্য এনেছি তাই,
ছিন্নভিন্ন করার চিহ্ন তুলে ;
দক্ষিণে, বামে, কোথাও লজ্জা নাই···
পিছন-তাড়না করেছি আমার চুলে !

বন্ধু হাসেন—কথাতে কি ভেজে চিঁড়ে ?
আসলে প্রবীণ তরুণ সাজিতে চাও ;
শ্মশানে বিয়ের আল্‌পনা-আঁকা পিঁড়ে—
তাহাতে দাঁড়ালে নবোঢ়া কোথায় পাও ?

যত তালি সব হাসে দিয়ে করতালি···
বিদ্রূপ করে প্রৌঢ় মুখের রেখা,
জান না, যেখানে লিখেছ সেখানে বালি—
বোঝ না, থাকে না বালির ওপরে লেখা ?

বন্ধুকে বলি, বন্ধু তোলে না কানে,
কেন যে আমারে এত নির্বোধ ভাবে—
বেয়াল্লিশেরে বিশেতে টানিয়া আনে,
এমন বুরুশ চোদ্দপুরুষে পাবে ?

ফিরে ফিরে চাওয়া কার না নয়নে ভরা,
ফিরে ফিরে চাওয়া, যদি ফিরে পাওয়া যায় ?-
বিরাশি বছরে সবাই স্বয়ম্বরা,
বরমালা নিয়ে ছায়ার পিছনে ধায়···

তা'বলে আমার চুলের পিছন-চলা
সুদূর মধুরে সে কি আর ফিরে পাবে ?—
পাথরেরও আছে গোপন জ্বলা ও গলা
তা'বলে কি কেউ পাথরে কাতর ভাবে ?

বন্ধুকে বলি, বন্ধু তোলে না কানে,
আয়না কেনার খরচ বাঁচিয়া যায়—
সেই এক কথা, গত যৌবন পানে,
আমার নয়ন তৃষ্ণা চাহনি চায়।

চক্রবৎ

পরিবর্তনের গোলক-ধাঁধায় ব্যক্তিসত্তা ও নামরূপের মূল্য কতোটুকু? একটা জিনিসই বোধহয় বারে বারে ঘুরে ঘুরে আসে চোখের সুমুখে·· খণ্ড খণ্ড রূপের মধ্যে একটি অখণ্ড অনন্ত জীবন পোশাক বদলে আসে থেকে·থেকে।

যে মেয়েটিকে দেখেছি সকালবেলায়, ছাপা সিল্কের শাড়ী পরে কলেজের বাসে, তাকেই আবার দেখতে পাই সাদা জর্জেট পরে সিনেমা হলে বসে আছে···

গত কাল হায় আগামীকালের তরে
চুপি-চুপি-বলা যেকথা গিয়াছে রাখি,
ঝরা ফুল, আর শুক্‌নো পাতার 'পরে,
আজ কেন মিছে তার লাগি হাঁকা-হাঁকি···
আজ নয়, কাল, অবগুণ্ঠন তুলে,
গত কাল, প্রিয়, হয়তো খুলিবে আঁখি।

আশ্বিনে হায়, যে শেফালি ঝরে প'ল,
ফাল্গুনে সে কি বকুল হইয়া ফোটে ?
কেতকীর যত কথা নাহি বলা হ'ল,
আম্রমুকুলে তাই কি আকুলি ওঠে ?
ঘন যামিনীতে নিশিগন্ধার বাণী,
সোনা হয়ে ফোটে কনকচাঁপার ঠোঁটে ?···

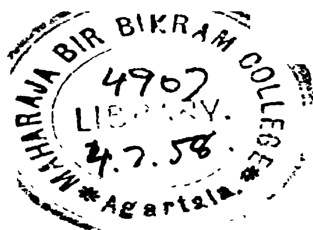
হায়, আজ তবু আর্ত শিশির-নিশা,
আশ্বিন কাল শেষ হয়ে গেছে ঝরে···
ফিরে বুঝি কাল ফাগুন জাগাবে তৃষা,
কুঁড়ির মর্মে নব জাগরণ তরে,
গত যৌবন নব-যৌবন পানে,
আজ কেন তবে চাহিয়া চাহিয়া মরে ?·

হাঁ-করা

যতোই 'হাঁ' 'হাঁ' বলে ভারটিক্যাল্ ভাবে ঘাড় নাড়তে পারবে ততোই ভালো, ততোই নির্বিবাদে আর নির্ঝঞ্ঝাটে দিন কাটবে। হরাইজেণ্টাল্ কায়দায় ঘাড় নাড়ার অর্থ হচ্ছে 'না' বলা। অতএব ঐ রকমভাবে ঘাড় নাড়া বন্ধ করে দাও। যতোই নাড়বে হরাইজেণ্টাল্ ঘাড়, ততোই বাড়বে নিরানন্দ, ততই বিষিয়ে তেতো হয়ে উঠবে সমস্ত জীবন।

বিশ্বজগতে সকলেই চায় তুমি 'হাঁ' বলো। শুধু তুমি নয়, সবাই বলুক ; এমন কি পশুপাখী কীট পতঙ্গ পর্যন্ত সবাই 'হাঁ' বলুক।

অতএব…



হাঁ, হাঁ, বলে যেও ভাই,
বলে যেও যত পারো,
যদি বা হাঁ করে থাকো
দৃষ্টি পাবে না কারো,—
ভারটিক্যাল্ ভাবে ঘাড় নাড়া চাই,
এই কথা জেনে রাখো…

স্ত্রী যদি বলেন কিছু,
চোখ আধো-নিচু করে,
বেশ করে নেড়ো মাথা—
নেড়ো, হাঁ বলার তরে।
হাঁ, হাঁ, বলে ঘুরো ভার্যার পিছু,
মাথে ধরে থেকো ছাতা…

যদি কারো টাকা ধারো,
তাগাদা করিতে এলে,
হাঁ বলে, বিদায় দিও,
একটু সুবিধা পেলে ;
হাসি হাসি মুখে হাঁ বলিয়া তারো
অস্ত্র কাড়িয়া নিও…

যদি বা বলিয়া থাকো
কোন তরুণীকে কভু,
তুমি বড়ো মনোরমা—
সাবধানে থেকো তবু ;
যদি কোনদিন কোন কথা ঢাকো,
হাঁ, হাঁ, বলে দিও কমা···

অফিসের বড়োবাবু
জ্যান্ত দেবতা তিনি,
যা কিছু বলেন তেতো,
হাঁ বলে মিশিও চিনি ;
হাঁ, হাঁ, বলে তারে করে নিও কাবু,
মিঠে হাসি হেসে দেঁতো···

হাঁ, হাঁ, করা নরনারী,
চাহিদা তাহার বড়ো,
তা লাগি পাগল ধরা
সবে চায় হাঁ হাঁ করো,—
আমি তো কিছুতে বুঝিতে পারি না,
'না' বলিয়া কেন মরা···

কাশফুল

তপতী সেদিন হঠাৎ এক গোছা কাশফুল দিয়ে প্রণাম করে গেল অধ্যাপকমশাইকে। নিম্নলিখিত কবিতাটা দিয়ে অধ্যাপক তপতীর প্রণামকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

সেদিন হঠাৎ ফুল নিয়ে এলো তপতী…
চাঁদ-চুরি-করা-মেঘের মতন আলো,
কে জানে, কখন ছড়ালো যে চোখে মুখে,—
হুট্ করে এলো ঘরের ভেতরে ঢুকে,
টেবিলে লিখছি, সামনেতেই দাঁড়ালো…

এক গোছা ফুল হাতে ছলছল করে,
কাশফুল একগোছা,
মনে হল ওরা এক্ষুণি কাঁদছিল,
এক্ষুণি চোখ মোছা—

বললে, শুনেছি কথায় কথায় আগে,
কাশফুল নাকি আপনার ভালো লাগে ?
দুর্গম পথে পাহাড়ী-নদীর ধারে,
দেখতে পেয়েছি, কুড়িয়ে এনেছি তাই,
এদের প্রণামে, আপনার টেবিলেতে,
আজকে সকালে তপতীকে রেখে যাই…

* * *

সেই দিন থেকে তপতী রয়েছে কাছে,
একফোঁটা মেয়ে সবটা স্বপ্ন মাখা ;
কাশফুলগুলো ওরই তো' মতন ঋজু,
ঊর্ধ্বে অসীম আকাশে মেলেছে পাখা—

ওরা যেন সব শেলীর পাখীর গান,
উড়ে উড়ে যায় আরো দূরে, আরো দূরে ;
কাশফুলে যেন সুর-কপোতীর প্রাণ,
ধক ধক ধক কাঁপে অজানার সুরে···
তপতী, তুমি তো থার্ড ইয়ারেতে পড়ো,
শেলী পড়িয়েছি কাল তোমাদের ক্লাসে,—
চোখ তুলে দেখি, তপতী গিয়েছে চলে,
মুখ নিচু করে ফুলগুলো সব হাসে···

ফলাতীত

বিয়ের পর এগারো বছর ধরে রূপদক্ষ স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে রুচি নিয়ে অবিশ্রাম কলহ চলে এসেছে; প্রত্যেকেরই ধারণা তার রুচিই বড়ো। স্ত্রী বলে, আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্রী; স্বামী সে কথা উড়িয়ে দিলে বলে, রুচির ব্যাপারে পণ্ডিচারীর কাছে শান্তিনিকেতনের দাঁড়াবার পর্যন্ত স্থান নেই·····আমার শিক্ষা পণ্ডিচারীতে।

অতএব আর কি? ঝগড়া করো আজীবন।

একদিন একটা ফুল নিয়ে ঐ রকম একটা ঝগড়া অঙ্কুরিত হবার উপক্রম হতেই 'ব্রেন ওয়েভ' এলো স্বামীর কাছে। সে বললে, সুমুখের বাগানটাকে দু'ভাগে ভাগ করে বেড়া তুলে দেওয়া যাক।···তারপর এক বছরের সময়···এক এক ভাগ নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী বাগান তৈরী করি আমরা। পরে, এক বৎসর হয়ে গেলে, দেশের যত প্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত রসিক ও রূপদক্ষ আছেন, তাদের আমন্ত্রণ করে এনে বাগান দেখানো যাবে। তাঁরা যার বাগানের প্রশংসা করবেন, তারই রুচিকে বড়ো বলে মেনে নেওয়া হবে সেই দিন থেকে।

স্ত্রী বললে, এ প্রস্তাবে সম্মত আছি, তবে একটা শর্তে: এই এক বছর কেউ কারুর বাগানে ঢুকতে পারবে না—

স্বামী মেনে নেয় শর্তটাকে। বাগান ভাগ হয়ে যায়, বিপুল উৎসাহ নিয়ে দুজনেই লেগে যায় বাগান তৈরী করার কাজে···

তবুও, একটু যেন অস্বস্তি জাগে মাঝে মাঝে······মাঝে মাঝে

তবু বেশ ঝগড়া হত দুজনের, বাগান ভাগ হওয়া পর্যন্ত তাও বন্ধ হয়ে গেছে ···

তিন মাস পরেই স্বামীর বদলি হবার চিঠি এসে হাজির। বাগানের কাজ তখনও বারো আনা বাকী। স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললে, আমি চাকরি করি না, অতএব আমি বদলি হইনি। তুমি যেখানে যাবার যাও, আমায় শুধু এই বাড়ীতে থাকবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাও,—আমি নির্জনে বসে আমার বাগান তৈরী করব।

স্বামী বললে, হ্যাঁ, কিন্তু বিরহ কি ভালো লাগবে?

স্ত্রী বললে, এগারো বচ্ছর আমরা টি-বি রোগের মত লেগে আছি সঙ্গে সঙ্গে। এখন বিরহের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাছাড়া বিরহ হলে আমার বাগান 'মেঘদূত' হয়ে ফুটে উঠবে···

তারপর যক্ষ নির্বাসিত হয়ে গেল রামগিরিতে—যাবার দিন স্বামী বললে, আমার বাগান এর আগে যে কোন লোককে দিতে পারতুম, এক তুমি ছাড়া। কিন্তু আজ তাকে তোমার হাতে দিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যাবার সময় শুধু একটা অনুরোধ করে যাচ্ছি, ইচ্ছে হলে, আমার ওপর অন্যায় কোরো কিন্তু আমার বাগানের ওপরে কোনদিন অবিচার করো না।

তারপর আরও তিন মাস কেটে গেছে···হঠাৎ ছুটি নিয়ে, না জানিয়েই, স্বামী চলে এসেছে ঘটনাস্থলে। স্টেশন থেকে সোজা পৌঁছে গেছে বাড়ীতে · নিজের বাগানে ঢুকেই দেখে, স্ত্রী মালীদের নিয়ে বাগানের কাজে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।···

· এক জায়গায় অনেকগুলো কুলীন ফুল গাছের একটা বিপুল বৃত্তের মধ্যে সিমেণ্ট করা ছোট একটা থামের মত। তার ওপরে ওটা কি? স্বামী দেখতে পেলে একটা কুমড়ো লতা সাপের মত চকচক করছে শুয়ে শুয়ে ও একটা সদ্য-প্রস্ফুটিত কুমড়ো ফুল সকাল বেলার বাতাসে মাথা নেড়ে নেড়ে বেহায়ার মত নাচছে তার গায়ের ওপর···

প্রচণ্ড আঘাত লাগলো রসচেতনায়—একি, এই পরিবেশে কুমড়ো ফুল! রাজকুমারীর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে ঘুঁটে কুড়ুনীর মেয়ে?···তারপর আরম্ভ হল তুমুল ঝগড়া···সেই ঝগড়াই রূপ ধরেছে নিচের কথোপকথনে:

"হায় হায় সখী, ফুল্ল কাননে তব,
কেমনে সহসা ফুটিল কুমড়ো ফুল ?
এতো এ্যানোম্যালি কেমন করিয়া সব,
এমন তীক্ষ্ণ এ্যানাক্রনিজম্ হুল ?

একপাশে হায় গুচ্ছ হাসনাহানার,
রক্তগোলাপ বিলাপোচ্ছ্বাসে মূক,—
মাঝখানে ঝাউ, হাউ হাউ কাঁদে, তার
কুমড়ো পরশে শুকায়ে গিয়াছে বুক···

গান্ধীনীতি কি রাষ্ট্র ছাড়িয়া এলো,
কানন রীতিকে নষ্ট করার তরে ?—
হরিজন হায় হেথাও আসন পেলো,
দেবতার পাশে, সিংহাসনের পরে ?

চারুচেতনায় এতোটুকু বাজে না কি,
রুচির কি তব অরুচি হয়েছে গুরু ?···
ফিতে খুলে 'স্যু'তে পরালে হাতের রাখী,
পায়ের বালিশে মাথা রাখা হল সুরু ?

প্রিয়ার কাননে নিন্দা কুমড়ো ফুলের,
বুলেটের মত পেলব বক্ষে বাজে,
চুলে আধো-ঢাকা দুইটি কর্ণমূলের
রক্তপ্রবাল চিনে ওঠা যায় না যে···

রক্ত অধরে কুয়াশা জমেছে ঘন,
চোখে চোখ দুটো তুলিতে চাহে না প্রিয়া,
কুমড়ো ফুল কি মানিয়েছে কক্ষনো,
এমন কাননে প্লিবিয়ান রূপ নিয়া ?"

"গতানুগতিকে বদ্ধ তোমার মন,
নাহিকো ছন্দ, নয়নানন্দ-গতি ;
স্ট্যাটিক্ পাথরে চাপা তুমি অনুখন,
অতিরক্ষণছিন্ন ছন্নমতি···

কুমড়ো ফুলের রূপ সমুদ্রখানি
আপন গরবে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে,
ঘন শ্যামলিকা কুমড়ো লতার বাণী,
আমার কাননে, কুসুম হইয়া ফুটে।

গন্ধ নাহিকো, অন্ধ লোকের কথা,
গন্ধ তাহার নাসায় দেয় না ধরা,—
বড়ো সে লাজুক, তাই ঘন নীরবতা,
অনাগত তার ফলের গন্ধে ভরা···"

* * *

"কানে কানে বলি, এগারো বছর গেলো
মোদের কাননে ফল ধরে নাই ফুল···
কত শিশুমুখ দু'হাত বাড়ায়ে এলো,
আজো বিলাসিনী, আজো শুধু কাঁটা হুল !"

পাথরের চোখ

তরুণী মেয়ে জামায় রুমালে সেণ্ট মেখে থাকে সব সময়, চতুর্দিকে গন্ধ ভুরভুর করছে।···

আকর্ষণের সীমা পরিসীমা নেই। একে সৌন্দর্য ও তারুণ্য, তার ওপরে অপূর্ব সুগন্ধ। তার দিকে চাইলেই দেখবে সে ঠিক তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। অহরহ কেবল টানবারই চেষ্টা সব দিক দিয়ে···

তবু তাকে একটুও বোঝবার উপায় নেই। বড়ো বড়ো চোখ দুটো ভাষাহীন, সেদিক থেকে কোন উত্তর পাবে না কোন জিজ্ঞাসার।

কতো দিন থেকে কতো লোকে বোঝবার চেষ্টা করেছে তাকে, কেউ বুঝতে পারেনি আজ পর্যন্ত। কেউ পারেনি, তুমি কি বুঝতে পারবে পাথরের চোখকে ?

কে একজন সেদিন বলছিল, জীবনও নাকি ঠিক ঐ রকম। সব সময় আকর্ষণ করে জীবন, অথচ আজ পর্যন্ত তাকে নাকি কেউ বুঝতে পারেনি।

সেণ্ট মেখে থাকে জামায় রুমালে,
ভুরভুর করে গন্ধ—
শুধু ঐটুকু, বাকীটা বিষম ছন্দ…
ডাগর ডাগর চোখ ছুটো,
তাতে ভাষার বালাই নেই,
তাকিয়েই আছে তার দিকে চাইলেই—
আপনি থেকেই, সময় দেখেই তাকায় ;
অনেক দিন তো এমনি গিয়েছে,
চোখ নিচু করে ফিরে তাকিয়েছে—
তাকালে কি হবে ? পাথরের চোখে চায়…

সেদিন তো ছিল ঝিরঝির করে হাওয়া,
সেদিন তো কাঁদে দূর থেকে আসা বাঁশী,
সেদিন বলার, জ্বলার, গলার, অনেক সম্ভাবনা—
চাপা আগুনের থেকে থেকে জাগে ফণা…
হায় পোড়া মন, হায় রে, বিপরীত ভাষাভাষী,
পাথর চোখের নিচে চমকায় শকুন্তলার হাসি…

কখনো দেখেছি অন্ধ শ্রাবণ পেখম ধরেছে মুখে,
রকম সকম কেমন কেমন কেন ?
ছড়ানো, গড়ানো, রক্ত-বরণ-শাড়ীর পাড়টা বুকে,
তাজমহলের সুরকি-রাস্তা যেন—
ভয়ে ভয়ে যতো তাকিয়েছি,
ঝড় ওঠবার ভয়ে—
ভুরভুর করে এসেছে গন্ধ বয়ে…

কালো এলোচুলে, কি যেন গহন, গোপন মনের কথা,
পাথরের চোখে ভাষাহীন কাতরতা···
চিবুকের কালো তিল,
প্রথম রবির দুধে-আলতার গায়ে
মনে হয় ওড়ে চিল—
হাতছানি দিয়ে আমার মনকে
কোন নিঃসীমে ডাকে,
ঘুম-তারাদের ঝাঁকে ;
আমার ফানুস, জয় করে নেয় মানুষের শঙ্কাকে।
গুটিয়ে গিয়েছি তাকিয়ে চোখের দিকে—
হায় পোড়া মন, হায় রে, সুদূরের ভাষাভাষী,
বিদিশার ঠোঁটে, কেন ফুটে ওঠে
তক্ষশিলার হাসি ?

তবু তো পেয়েছি সব দিকে তার
ভুরভুর করা গন্ধ—
হোক তারপর, কুয়াশা কুয়াশা,
সবটুকু হোক সন্দ···
চোখ দুটো তার পাথর পাথর বড়ো,
নিমন্ত্রণ আর বারণ কিছুই নেই—
তাকিয়েই আছে তার দিকে চাইলেই···
চোখ থেকে মুখে, কি যেন চিবুকে
নেমে আসে ধীরে ধীরে,
ঝাপসা লেখার মতো—
বুঝিতে পারি না, প্রয়াস করেছি কতো···

তবু মনে করি ঐ টুকু নিয়ে যাবো,
ঐ ভুরভুরে গন্ধ—
সারা প্রাণ নেবো কানায় কানায় ভরে ;
মনে হয় খুঁজে, ঐখানে বুঝে পাবো,
ঐ পাথরের ছন্দ—
চাইবো না চোখে, মন কর-কর করে…
মনে ভাবি, বুঝি পৃথিবীটা শুধু
ফুলের গন্ধভরা,
যতো ফুল, তার বুক-চটকানো গন্ধ ··
হায় পোড়া মন, হায় রে,
দুটো ঠোঁটে রাশি রাশি,
রক্তমাংসে অহল্যা হাসে
পাথর হবার হাসি…

হোলির দিনে

লোকে বলতো, আলট্রামডার্ণ মেয়ে। বি. এ. পাস করে একটা সওদাগরী অফিসে স্টেনোটাইপিস্টের কাজ করছে কিছুদিন থেকে। সাইকেলে চড়ে অফিসে যায়।

একটা নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারের অনূঢ়া মেয়ে স্থরঞ্জনা—অনেকগুলো মুখের খাবার জোটে স্থরঞ্জনার মাইনের টাকায়। অফিসের 'বস' উচ্চশিক্ষিত নব্যযুবক, এই সেদিন বিলেত ঘুরে এসেছে—অত্যন্ত ভদ্র আচরণ করে স্থরঞ্জনার সঙ্গে।

হোলির আগের দিন…'বস' বললে, কাল দোলের ছুটী, কিন্তু কিছু যদি মনে না করেন, ঘণ্টা দু'য়ের জন্যে যদি সকাল বেলায় আসতে পারতেন কাল, তা' হ'লে অত্যন্ত জরুরী কতোগুলো কাজ সেরে ফেলা যেত। সকালবেলাই খুব মাতামাতি করবেন নাকি রং খেলা নিয়ে?

মৃদু হেসে স্থরঞ্জনা বললে, না, সে রকম কোন সম্ভাবনা নেই। আমি ঠিক ন'টার সময় আসতে পারবো।

সকাল ন'টায় নিজের টেবিলে গিয়ে বসেছে স্থরঞ্জনা। কালকের কিছু বাকী কাজ ওরই কাছে ছিল, সেটা বার করে টাইপ করতে আরম্ভ করেছে একমনে, এমন সময় পেছুন দিকে ধপধপ করে ভারী জুতোর শব্দ হ'ল।

ফিরে তাকাবার আগেই তেল আবীর মাখা এক জোড়া হাত পেছুন থেকে রং মাখিয়ে দিলে তার সমস্ত মুখে। চোখ তুলে দেখে, হাসিমুখে 'বস' দাঁড়িয়ে আছে চেয়ারের পেছুনে। খুব রাগ হয়ে গেল হঠাৎ…বলে ফেললে, এ আপনি কি করলেন? বেশ সপ্রতিভ ভাবে 'বস' বললে, আজকে দোলের দিনে আপনার বন্ধুত্ব, আপনার তারুণ্য ও সৌন্দর্যকে আবীর দিয়ে প্রণাম করেছি। কোন অন্যায় কাজ তো করিনি…

'বসে'র কথা শুনে আরও যেন রাগ বেড়ে যায় সুরঞ্জনার। কিছু কথা কাটাকাটির পরে প্রবল রাগের বশে সুরঞ্জনা বলে ফেলে, আপনার মত ক্রুটের কাছে কোন ভদ্র মেয়ে কাজ করতে পারে না।

বেশ, তবে তাই হোক, বলে পাশের ঘর থেকে চেকবই নিয়ে আসে 'বস', হিসেব করে তার মাইনে মিটিয়ে দেয়। বলে, নমস্কার। এর পরে যদি কোনদিন সময় মেলে, এই ব্রুটটাকে পারলে, ক্ষমা করতে চেষ্টা করবেন।

* * *

বাথরুমে সেদিন সাবান নেই। শুধু জল দিয়েই যথাসম্ভব রং তুলে ফেললে মুখের—তবু সমস্ত মুখময় ছোপ ছোপ লাল রং লেগে রইলো।

অনেকগুলো লোকের আহার জোটে সুরঞ্জনার মাইনের টাকায়—অথচ চাকরি চলে গেল হঠাৎ। মনটা খারাপ হয়ে গেল খুব, বাড়ী যেতে ইচ্ছে করলো না—সাইকেলটা নিয়ে অফিস থেকে সোজা চলে গেল ইডেন বাগানে।

সেখানে যার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, তাকে একদিন ভালোবাসতো সুরঞ্জনা।—কিছুদিন আগে সামান্য একটা কথা নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেছে ওদের—তারপর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি দুজনের। আজ সুরঞ্জনার চাকরি গেছে, কিন্তু অন্যজনও ছ'মাস ধরে বেকার অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে ; ছ'মাস হতে চললো ওরও চাকরি বাকরি কিছু নেই। দেখা হতেই, নিজের চাকরি যাবার কাহিনীটা সব ওকে বলে ফেললে সুরঞ্জনা।

নীচের কথাগুলো সেই প্রেমিকই বলছে সুরঞ্জনাকে :

অফিসের 'বস' জবাব দিয়েছে নাকি,
রাখো সাইকেল এইখানে কাত করে,
এসো ছায়াতলে চুপ করে বসে থাকি,
বেঞ্চিতে নয়, এখানে ঘাসের 'পরে—
অফিস ছেড়ে কি সোজা এখানেই এলে,
ইডেন বাগানে, একলা দ্বিপ্রহরে ?

জ্বলে জ্বলে প্রিয়া গলে গলে গেছে মন,
অফিসের 'বস' বশ হয়ে গেছে খুব,
জবাব দেওয়াটা শেষ জ্বলবার ক্ষণ
হঠাৎ চমকে ঘন তমসায় ডুব···
জবাব দিয়েছে, জবাব পায়নি বলে,
অভিমানে দূরে ফেলে দিলে কৌস্তুভ।

ছ'মাস আমার চাকরি গিয়েছে ঘুচে,
রোজ এইখানে দুপুর বেলায় আসি,
ফাগুনে ভৃঙ্গ কুসুমে কুসুমে পুছে,
ফেরে ফেরিওলা, আমি রই উপবাসী—
আজকে বাতাসে বিলাস বেদনা ভরা,
তোমার অধরে ধোয়া-আবীরের হাসি।

অফিসে যেতেই পেছুন পেছুন এসে,
মুখেতে বুলোলো আবীর মাখানো হাত,
অফিসের বস ?   এত স্পর্ধার শেষে,
ফণাধরে বুঝি করলে রসনাঘাত ?
হায় প্রিয়া, হায়, আজ এ হোলির দিনে,
অঘটন ঘটে এমনই অকস্মাৎ···

হোলির দিনেতে একটা কথাই ঠিক,
নরনারী আজ নির্জলা নরনারী ;
দশটা দিকের আজ একটাই দিক,
এ নয় প্রশ্ন কি রঙে রাঙানো শাড়ী—
ঐ শোন গাছে কোকিলের ওকালতি,
আজকের দিনে কিছু নেই বাড়াবাড়ি···

পৌনে বারোটা,···তপন দ্বিপ্রহরের,
টেনে যে গুটোয় তোমার আমার ছায়া ;
কাছ ঘেঁষে বসি, বেদনা-যাদুঘরের
প্রস্তরীভূত দুখানি করুণ কায়া—
একজন, তার জবাব গিয়েছে মিলে,
অন্যজনের আজো জবাবের মায়া।

তুমিতো বেকার, আমার চাকরি গেছে,
বনমর্মরে আজ জাগে আকুলতা,
ধার করা টাকা এখনো একটা বেঁচে,
তা দিয়ে আজকে রাঙ্গাবো ও তনুলতা—
শেষ টাকা যাক আবীরের পাখা নিয়ে,
বুকে, মুখে, যেথা পুষ্পিত অমরতা···

সাইকেল-চড়া বৃন্দাবনের রাধা,
সাইকেলে যাই, কাছেই আবীর পাবো,
তোমার বাঁদিকে জাগে যে গোলাপ সাদা—
তোমাকে ও তাকে, দুজনাকে রাঙ্গাবো ;
তুমি তো আবীরে তোমার জবাব পেলে
আমার জবাব আমিও আবীরে চাবো ?

প্রহার-ইচ্ছু

গান্ধীজীর মধ্যস্থতায় কলকাতা শহরে হঠাৎ থেমে গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—তারপর অকস্মাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠলো আবার। ফলে বেলেঘাটায় গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করলেন।

বউবাজারে একটা বাড়ীর দোতলায় দাঁড়িয়ে হত্যাকাণ্ড দেখছি···কারফিউ, জনশূন্য পথঘাট···তারই মধ্যে এক একজন করে ধরে আনছে ওরা—এক এক করে হত্যা করছে গলায় ছুরি দিয়ে। সকাল বেলায় হঠাৎ দাঙ্গা লাগবার সময়, পাশের বাজারে অনেকগুলো লোককে বন্দী করে রেখেছিল, বাজারেরই দুটো ঘরে। তারপর বিকেলবেলা, কারফিউ হবার পর ধীরে সুস্থে হত্যা করছে। পুলিশের গাড়ীর শব্দ পেলেই গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ওরা···

আজও মনে পড়ে একজন ভদ্রবেশধারী লোকের গলায় ছুরি দিয়ে দিয়েছে ওদের ঘাতক···সে ফুটপাথে শুয়ে শুয়ে ছটফট করছে মৃত্যু যন্ত্রণায় ··

প্রবল বিদ্রোহে ভরে উঠলো সমস্ত সত্ত্বা—দারুণ ক্রোধে সমস্ত বিশ্ব সংসারকে চূর্ণ করে ফেলবার ইচ্ছা অভিভূত করে ফেললো মনকে·· সেই উত্তেজনাই রূপ ধরেছে কবিতায় :

হাত জোড় করে প্রণাম করি না শুধু,
প্রহার-ইচ্ছু মুষ্টি হানতে জানি ;
তুমি কি আমাকে রাখতে পারবে বেঁধে ?—
আজ দিকে দিকে আগুন জ্বলছে ধুধু,
দিকে দিকে শুধু টানাটানি, হানাহানি,
দুপুর বেলায় কুকুর বেড়ায় কেঁদে···

শকুনের চোখে হেলেনের ছায়া পড়ে,
ক্লান্তিতে কতো হাই তোলে বাসি মড়া,
কাল্‌চে রক্ত শুকিয়ে এখানে ওখানে,—
মানুষের প্রাণ বিকোয় জলের দরে,
দুনিয়াসুদ্ধ মদ কি গিলেছে কড়া ?
চোরাই সীতার নিলেম দোকানে দোকানে···

প্রহার-ইচ্ছু বজ্রের মত মুঠো,
দু'হাতে কেবল চিৎকার করে ওঠে,
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে বুঝি ভালোবাসা,—
কসাইখানায় চন্দ্রসূর্য দুটো,
ডিউটি বাজাতে সকাল সন্ধ্যে ছোটে ;
তাকিয়া-হেলান ভগবান খেলে পাশা···

তুমি কি আমাকে রাখতে পারবে ধরে ?
সংযম যদি আমারো হারিয়ে যায়,
—আত্মঘাতী কি হ'বে মানুষের আশা ?—
পৃথিবীটা আজো ফলে ফুলে আছে ভরে,
আজোতো শিশুরা মার বুকে দুধ খায়,
অশথ তলায়, আজো দূর্বার বাসা···

এ্যাস্‌ট্রে

এ্যাস্‌ট্রের দুঃখ কেউ বোঝে না। তাকে ঘিরে গল্পগুজব হয় নানা রকমের, অনেক কোমল মধুর রুদ্র ভীষণের পালাগান চলে দিন রাত্তির। তারপর যে যার ছাই ঝেড়ে শেষ পর্যন্ত সব-পোড়া নিশ্চিহ্নপ্রায় সিগারেট খণ্ডটা তার মধ্যে ফেলে দিয়ে নিজের পথে এগিয়ে চলে যায়।

অনেক ছাই আর খানিকটা ধোঁয়া নিয়ে এ্যসট্রে বসে থাকে একেবারে একলা। কেউ ভাবে না তার কথা।

কেউ কি বোঝে, মানুষের সঙ্গ পেয়ে সে তখন বাঙ্ময় ও চিন্ময় হয়ে উঠেছে ?

এ্যাস্‌ট্রে তার নিজের দুঃখের কথাই বলছে ··

আমি এ্যাস্ট্রে হায়, জমা করি ছাই,
আগুন তো মোর কাছে নাই।
সকালে রাত্তির বেলা, জমে তোমাদের মেলা,
জ্বলে সিগারেট মুখে মুখে—
কত ভালোবাসা, কত টেনে নেওয়া বুকে,
ফেনায়ে বারিধি রচা কত সে বিন্দুকে,
কত না সংঘাত জাগে—
কত গুলিগোলা হাঁকে কত না বন্দুকে॥

কুলে কুলে অকুলতা, বুঝি শ্রান্তি, তাই,
মোর মুখে অবিরাম হাই—
একটা না-আসা ঘুম,
নাই কোন মরসুম
তার মাঝে আঁখি মুদিবার ;
বুকে টানাটানি রাতি, সকাল ন'টার,
ঘুমে ভারি অঙ্গভাঙ্গা, তার পরিখার
বাহিরে আমার স্থিতি—
জ্বালা নাই, মালা নাই, আনন্দে মাতার॥

আমি এ্যাস্ট্রে হায়, ফেলো তব ছাই,
আমার তো না বলার নাই…
সকালে রাত্তির বেলা, কোথা তোমাদের ভেলা,
ছুঁই ছুঁই, দূরে ভেসে যায়
মোর মৃত্যুহীন হাই, বাক্যহীন হায়—
শেষ চুমু যারা সব করেছে আদায়,
টুকরো জ্বলন্ত-জ্বালা,
সেই সিগারেটে কাঁদে ধূমল বিদায়॥

আগুন সে তোমাদের, মোর শুধু ছাই,
আমি পুড়ে শেষ হওয়া পাই—
একটা না-আসা ঘুম,
আধখানা পাওয়া চুম,
তাই বুঝি কাঁদার প্রয়াস—
ছাই, ছাই, সব ছাই, কিছু নাই আশ,
আমার হাঁ-করা মুখে জাগে বারোমাস,
দন্তহীন, প্রাচীন বিলাপ—
কুণ্ডলিয়া উঠে ধূমে চিতার নিঃশ্বাস।

মাটির বুকে

মাটির বুক থেকে আসছে প্রিয়ায় বুকে প্রতিধ্বনি। প্রভাতের বাণী নিয়ে মিছিল চলেছে চোখের সুমুখ দিয়ে এগিয়ে। একদিকে ফুল ঝরছে, অন্যদিকে ফুটে উঠছে নতুন কুঁড়ি...

পৃথিবীর চোরাটান জাগছে প্রিয়ার মাটির শরীরে...

এইখানে দাও, এইখানে পাতি কান,
এই যে এখানে ধকধক করে বুক···
আগে পরে ঢেউ, গতি-উচ্ছ্বাস মেলা,
এক দুই তিন, ঢেউ গুণে গুণে খেলা,
কেউ নেই, শুধু একলা পাখার গান,
এইখানে দাও ঝরা পালকের সুখ—
এই যে এখানে ধকধক করে বুক···

বোবা আকাশটা কেন যে তাকিয়ে আছে,
বহুদূর ডোবা অথই সাগর জলে,
গুঁড়োগুঁড়ো চাঁদে, ঐ ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে
গোপন প্রেমের আখর উঠেছে জেগে ;—
সিঁদুরের দাগ মোছা আয়নার কাঁচে,
আনমনা কার প্রসাধন কথা বলে···

এইখানে শুনি প্রতিধ্বনির মত
এক পা এক পা এগিয়ে চলার ধ্বনি—
শুধু ওঠানামা, হু হু নিঃশ্বাস জাগে,
ছায়া ছায়া কিছু, তবু চেনা চেনা লাগে,
বিস্ময় যত সয়, সংশয় তত—
খনির তিমিরে দিকে দিকে জ্বলে মণি,
দূর ছায়াপথে এগিয়ে চলার ধ্বনি···

উথলে উথলে এখানে মিছিল চলে,
কত যে মানুষ, সেই প্রভাতের বাণী···
কত হানাহানি, কত না রক্ত ছোটে,
পথের দুধারে তবু কত ফুল ফোটে ;
মরা পাঁপড়িতে কুঁড়ির স্বপন জ্বলে—
ঝরা পল্লবকে আকাশের হাতছানি···

তুমি পেতে রাখো পৃথিবীর বুকে কান,
কাঁচা সবুজের আঁচল ঢাকা যে বুক—
আমি এইখানে ধকধক বুকে থাকি,
সারা দেহ মনে মাটির ছোঁয়াচ মাখি,
তোমার মাটিতে পৃথিবীর চোরা টান,
আমার রক্ত উৎসুক, উন্মুখ—
এই যে এখানে ধকধক করে বুক···

একুশটা মেয়ে

অধ্যাপক মশাইকে পরীক্ষার গার্ড দেওয়ার অস্বস্তিকর কাজ করতে হচ্ছে···ফোর্থ ইয়ারের একুশটা মেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে হলে বসে। অধ্যাপক মেয়েদের সর্বাঙ্গীন সততার সম্বন্ধে সন্দেহহীন ; অতএব, ওরা যখন পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখছে, অধ্যাপক তখন ঐ মেয়েদের নিয়ে লিখছেন কবিতা :

পরীক্ষা দেয় ওরা একুশটা মেয়ে—
ফাইনাল বি-এ পড়ে, হেঁজিপেঁজি নয় ;
কতো জ্ঞান, অনুভূতি, কতো না বিস্ময়—
কচি কচি মনে ভরা, একুশটা মেয়ে…
আপসেতে যদি কিছু টোকাটুকি চলে,
পাছে ফিসফিস ক'রে কেউ কথা বলে,
শিয়রে যমের মত আমি আছি চেয়ে—
চলেছে ঘড়ির কাঁটা, বেজায় সে তাড়াতাড়ি,
খুব যেন আদাজল খেয়ে।

ষাণ্মাসিক পরীক্ষার ধুম—
ক'দিন পড়েছে রাতে, দুলে দুলে, ঢুলে ঢুলে,
কিছু পরে, বসে বসে ঘুম ;
ক'দিন দিনের বেলা,
পড়ার ওষুধ গেলা,
একঘেয়ে কাটা-ঘায়ে নুন—
কালো ফালি-চাঁদ যেন, দু'চোখের কোলে কালি,
ভয়ে ভাবনায় মুখ চুন !

একুশটা মেয়ে, ওরা কলম চালায়,
একুশটা, উসখুস একুশ জ্বালায়—
কারো মনে আসে নাকো, কারো বেশী কাটাকুটি,
কারো শেষে কেঁচে মরে একেবারে পাকা ঘুঁটি :
কন্‌টেক্‌স্ট ভুল হয়ে যায়—
কারুর খাতায় খোলা দোয়াত গড়ায়।

কলেজের বাগানেতে তুপুর-ময়ূর,
ছোপ-ছোপ-আলোছায়া-মাখানো পেখম,
এই মেয়েদের মুখে থমথমে মেঘ দেখে,
নাচে, মাতালের মত রকম সকম···
কলেজের বাগানেতে, তুপুরের ফুল,
অনেক পাঁপড়ি নিয়ে, ফুটে আছে ঐ—
এখানেতে এই হলে, বাইশ নিঃশ্বাস চলে,
একুশ মেয়ের শাড়ী রং থইথই···

দেখলুম···অকস্মাৎ, দশটা বছর,
পেরিয়ে, এগিয়ে গেছি, আমি আর ওরা ;
দশটা বছর লাগে, ছোপ ছোপ, ধোঁয়া ধোঁয়া,
ছিট ছিট, কিছু ডোরা ডোরা···

আমি তো দেখছি ওরা একুশটা ঘরে,
খুব কষে গিন্নীপনা করে—
ময়ূরটা নেচে নেচে, এখানে ওখানে গেছে,
ফেলে ফেলে একুশটা পাখা ;
কতো ঝড়-ঝাপটায় জাপটানো জীবনের
ভাঁজে ভাঁজে হাসি-গান ঢাকা—
বেশীটাই বিবাহিত, অনূঢ়া তো অল্প,
বেশীটার জীবনের সাধারণ গল্প ;
রয়েছে সম্ভাবনা, কারো কারো জীবনেতে এখনো,—
কেউ কেউ আজো যেন তু'মনা—

বেশীটাই হাসিমুখ, মাঝে মাঝে শুক্‌নো,
বেশীটাই নিজে করে রান্না—
স্বপ্নই বেশী বেশী, খেলার অবধি নেই,
প্রচুর গানের কলি, কম নয় কান্না…

* * * *

দেখলুম…দশ বছরের আগে সেই বাগানের
কে জানে, কেমন করে খুলে গেছে খিল,
সেই সব ফুলগুলো, হাসছে আগের মত,
ডাকে সেই পুরোনো কোকিল…

দশ বছরের আগে, যে সব কবিতাগুলো,
শুনিয়েছি ক্লাসে রোজ রোজ ;
একুশটা মেয়ে করে, বাগানের ঘাসে, ফুলে,
আজ সেই কবিতার খোঁজ—
যে সব স্বপনগুলো পেয়েছিল কবিতায়,
চেয়েছিল, যেগুলো জীবনে,
দশ বছরের পরে, যদি ফিরে পাওয়া যায়,
এই আশা একুশটা মনে…
আজকের মত নাচে দুপুর-ময়ূর,
আজকের মত বয় হু-হু-হু হাওয়া.
ওরা খুব লিখে চলে, আমি বসে বসে দেখি,
দশ বছরের পরে পেছুন চাওয়া ।

আমাকে আবার ওরা খুঁজবে নাকি ?
আবার নতুন করে বুঝবে মানে ?
আবার আসবে উড়ে, আগের পাখি,
দশ বছরের পরে এই বাগানে ?

আজকের মত জ্বলে, দুপুরের ফুল,
আজকের মত চলে, দামাল হাওয়া ;
কলেজের ঘরে ঘরে, ওরা মিছে খুঁজে মরে,
আমাকে সেদিন আর যাবে না পাওয়া…

দুর্যোগে

ভারতবর্ষে বৃটিশ ও সেই সঙ্গে বাঙ্গলা দেশে মুসলিম লীগ রাজত্বের শেষ দিনগুলো। তীব্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা—সমস্ত দেশে দারুণ বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য। আমাদের পাড়ার পুলিশ গলিতে গলিতে ঢুকে গুলি চালাচ্ছে…

সেদিন গভীর রাত্রে, আমাদের বাড়ীর সুমুখে, ফুটপাথের ওপরে, সোমাংশুকে গুলি করে মেরে রেখে গেছে পুলিশ—প্রচুর রক্তের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে তরুণ সোমাংশু। গ্যাস ও ইলেকট্রিক নিবে গেছে, কিম্বা হয়তো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে, —চতুর্দিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

আমরা সবাই প্রাণ হাতে করে বসে আছি…কিছু আগ্নেয়াস্ত্রের যোগাড় আছে, তা'ছাড়া ছাতের ওপরে ফুটন্ত গরম জলের ব্যবস্থা করেছি। সোমাংশুর মত আমাদেরও পুলিশ এসে গুলি করে যাবে, এ যেন আমরা নিশ্চয় করে জানি। তবু, কাপুরুষের মত মরব না, সাধ্যমত মেরে তবে মরবো, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে পুলিশ আসার প্রতীক্ষায় বসে আছি আমরা।

সেই দুর্যোগে আমার কাছে এলেন আমার কাব্যলক্ষ্মী…

অন্ধকারে ফুটপাথে সোমাংশুর মৃতদেহের ওপরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছেন, কাপড়ে রক্ত মাখামাখি। প্রচুর রক্ত মেখে, এলোচুলে, অতিশুভ্রা সরস্বতী, হঠাৎ এলেন সেদিন এই কাপালিক কবির কাছে। তখন অনেক রাত্তির।

তারপর, অনুনয় করছি কাব্যলক্ষ্মীকে…

কাব্যলক্ষ্মী, এলে এতো রাত্তিরে !
কথা রাখো, শোও খাটের তলায় ঢুকে,
দেয়ালের দিকে মুখ ফিরে—

ঘুটঘুট করে অনলরাত্রি কালো,
ফুটপাথে বুঝি রক্ত মাড়িয়ে এলে ?—
হোঁচট খেয়েছো ? সেটাতো বরং ভালো,
জীবন হারালে, চরণ পরশ মেলে···
তোমারও বসনে কাঁচা রক্তের লেখা—
ওটা মৃতদেহ, যেখানে আছাড় খেলে।

ঘুটঘুট করে অনলরাত্রি কালো,
এখানে ওখানে, সনসন গুলি ছোটে,
আজকে শহরে বিকল বিজলী আলো,
অলিতে গলিতে মৃতদেহ জমে ওঠে—
চালের শূন্য বস্তা ঢাকিয়া থাকো,
কাব্যলক্ষ্মী, ভরসা নেই কো মোটে···

আজ এতোদিনে আমরা উঠেছি জেগে,
প্রাণভয় তার এতোটুকু নেই লেশ,
যতো গুলি ছোঁড়ে, ওরা যতো যায় রেগে,
এগিয়ে চলেছে ততো আমাদের দেশ—
বিনিদ্র এই প্রাণ দেওয়া-নেওয়া রাতি,
রক্ত নয়নে চেয়ে আছে অনিমেষ···

ওগো এলোচুলে, ওগো মোর উন্মনা,
ওগো রংধরা কাঁচা মানুষের শোনিতে,
আজকে আকাশে নিদারুণ ঝনঝনা,
মূর্ছনা মীড়ে, ভঙ্গী, যতি ও ধ্বনিতে—
আজকে কাংস্যে হিংসাক্ষুব্ধ বাণী,
-আকাশ ভুবনে বাজায় রনিতে রনিতে··

মন্দাক্রান্তা ছন্দে হবে না বলা,
এখানে অচল কোমল মধুর কথা,—
কদলী ভখিল পেলব প্রেমের কলা,
উচ্ছ্বসি' জাগে, হিংসার নিঠুরতা ;—
কাব্যলক্ষ্মী, বস্তার আবরণে,
বঁটি হাতে হও গরিলাযুদ্ধরতা···

ঐতিহাসিক

ভালোবাসার ব্যাপারে একদিন রূপের মোহ ছিল, আসক্তি ছিল, নিবেদন ছিল ;—আজ আর সে সব কিছু নেই। আজ সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। চাঁদ নেই, শেষ রাত্তিরের আগেই ডুবে গেছে চাঁদ…কাল ছিল, আজ ঝরে পড়ে গেছে সব ফুলগুলো।

ছিল একদিন, এটাই হল ইতিহাসের মর্মকথা। ছিল, কিন্তু আজ নেই…

আজ শুধু পেছুন দিকে তাকাবার ইচ্ছে…

ফুল দিও, ভুল দিও, জ্বেলে দিও বহ্নি,
হায় প্রিয়, মুছে ফেলো চিহ্ন…
আমি নাকি নিরুপমা, আমি বুঝি তন্বী,
ফুটি-ফুটি ইষদুদ্ভিন্ন ?
একটু-একটু-জাগা-নবারুণ-সমারোহ,
ভোরের-উদয়াকাশ-ছিন্ন ?

প্রশ্ন কি ছিল কিছু, সেদিনের কুয়াশায়
মোটেই পাওনি বুঝি দেখতে ?…
হঠাৎ এলুম নাকি, ঝরাপাতা ঝঞ্ঝায় ?
চমকালে বুঝি গায়ে ঠেকতে ?
আমি শুধু এসেছিনু, কনকনে হিমরাতে,
আগুনে বিবশ তনু সেঁকতে…

ভুলে যেও, এসেছিল বানডাকা তন্বী,
দাউ দাউ বুকে জ্বলে শৈল,
একটু করুণ হেসো, বেহায়াতো ধন্যি !
নোটবুকে নাম লেখা রইল,…
ধুয়ে মুছে গেছে সব, এতদিন পরে তবু,
স্বস্তিতে নিঃশ্বাস বইল ॥

তুমি ছিলে রূপকার, রূপ দিয়ে বলতে,
মোর চোখ দুটো নাকি ঘুমঘুম…
বুকজ্বলা প্রদীপের আমি নাকি সলতে,
অলখ নটীর পায়ে ঝুমঝুম—
যৌবন ঝরে গেলে, রব নব-যৌবনা,
অধরেতে কামনার কুঙ্কুম…

একটা অশথ গাছ

আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যে ভিক্ষাপাত্রের হাতফেরাফেরি চলে গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুর আড়ালে আড়ালে। আজ যে ভিক্ষা দেয় রাজা সেজে, কালকে তাকেই হাত পাততে হয় ভিখিরীর মতো। তারই মুখে জেগে ওঠে কেবল দাও দাও রব···

একটা অশথ গাছ আগুন ফেরি করছিল সেদিন দুপুর বেলা। তারই কাছে শুনেছিলুম কথাটা···

একটা অশথ গাছ একেবারে একলা,
আগুনের পশরা মাথায়,
সেদিন দুপুর বেলা, নির্জন প্রান্তরে,
কে নেবে আগুন, হেঁকে যায়।
ঘনকালো শাড়ীখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরা,
ছিট ছিট ছিট সাদা রং,
যেন কোন বিদেশিনী, শরীরে উলকিভরা,
বুনো বুনো বেদেনীর ঢং···
মাথায় উপুড় নীল কলায়ের বাটী, তাতে,
বোশেখের খর রবি জ্বলে ;
আগুন এনেছি খাঁটি, আগুন, আগুন, শুধু—
বারে বারে পসারিনী বলে।

বোশেখের দুপুরেতে সব দিকে নিঝ্‌ঝুম,
কুম্ভকে বসে আছে পৃথিবী ;
তাম্রকুণ্ডে ধুধু, হোমের আগুন জ্বলে,
ছায়াগুলো, ছাই ঢিবি ঢিবি ;
আগুনের স্রোত চলে মাটি আর আকাশেতে
থইথই করে গলা পারা,
ঘাসে ঘাসে ত্রাস জাগে, আধমরা পশুপাখী,
মানুষে মানুষে নেই সাড়া···
এখানে অনেক আছে, আগুন এখানে কেন ?
পসারিনী তবু মরে হেঁকে,
কেন যে ওই তা জানে, আগুন এনেছি খাঁটি,
এই কথা বলে থেকে থেকে।

একটা অশথ গাছ একেবারে একলা,
তারপাশে আমি একা দাঁড়িয়ে,
একটা অশথ গাছ, কত ধূলো কত ঝড়,
কত ধুধু পথ এলো মাড়িয়ে···
বড় অদ্ভুত ঐ পসারিনী মেয়েটা.
কাল রাতে চাঁদ বেচছিলো,
আগুন বেচছে তবু, কোকিলের গানটুকু.
আঁচলে কখন বেঁধে নিলো—
তারপর একদিন, বেচবে আষাঢ় মাসে,
ঘনঘোর মেঘ থেকে জল,
দিনরাত, রাতদিন, ঝরঝর ঝরঝর,
বিদ্যুৎ-আলো-ঝলমল ।

ভিক্ষাপাত্র হাতে, আজকে আকাশ শুধু.
পৃথিবীকে দাও দাও করে,
শেষফোঁটা রসটুকু. সবটুকু চাঁচিমুছি,
কিছুতে অরুচি নেই ধড়ে—
শুষছে আকাশ ঐ পৃথিবীকে দিনরাত,
শ্রমিককে মালিকের মত ;
ওরা তো পায়না খেতে, ঠাঁই নেই মরবার,
পোড়বার কড়ি নেই অতো...
আজকে আকাশ শোষে পৃথিবীকে দিনরাত,
সব রস উবে উবে যায়,
বড়ো ভয়ানক ঐ সূর্য কাবুলিওয়ালা,
ধুলো বালি সব চুষে খায় ।

খিলখিল হাসে ঐ বিদেশিনী মেয়েটা,
বলছে আমাকে, ওগো মিতা,
মরা পৃথিবীটা আজ চিতার আগুনে জ্বলে,
পুড়ে পুড়ে নিবে যাবে চিতা—
সেদিন আসবে রাজা, বিদ্যুৎ-অসি হাতে,
কাবুলিওয়ালার হবে শেষ,
আবার সোনার ধানে, ঢেকে যাবে সব ছাই,
ধানে গানে ভরে যাবে দেশ…
সেদিন শুনবে শুধু দাও, দাও, দাও, দাও,
পৃথিবীটা আকাশকে বলে ;
আরো দাও, আরো দাও, দাও শেষ ফোঁটাটুকু,
সবটুকু ভরে দাও জলে।

একটা অশথ গাছ একেবারে একলা,
তারপাশে আমি একা দাঁড়িয়ে,
চোখ-ঝলসানো মাঠে কিছু নেই গাছপালা,
কে যেন দিয়েছে সব তাড়িয়ে—
প্রেতের মতন শুধু কিছু দূরে, আক ক্ষেতে,
ছায়াগুলো নাচে মাঝে মাঝে,
বিশ্রী তেষ্টা নিয়ে আকাশ তাকিয়ে আছে,
চোখে চাপা জল ভাঁজে ভাঁজে…
মাথায় উপুড় নীল কলায়ের বাটী, তাতে,
দাউ দাউ খর রবি জ্বলে ;
কোথা ঐ চিল ডাকে, আগুন আগুন চাই,
পসারিনী হেঁকে হেঁকে বলে।

অবাস্তর

এরোপ্লেন মানুষের জীবনকে নতুন রূপ দিয়েছে, নিয়ে এসেছে অনেক নতুন সমস্যা…

ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে ফড়িং চলছে,
ছেড়ে ছেড়ে যায় অনেক মাটি ;
আমার খাঁচার পাখিটা বলছে,
তুনিয়াসুদ্ধু কান্নাকাটি—
তাজা রোদ্দুর চাঁদের আলোতে,
বহু দূর দূর বিমান ঘাটি···

কাছের মানুষ নিমেষে হারায়,
দূরের, পলকে নিকটে আসে ;
ঘন বিস্ময়ে চোখে চোখে চায়,
অশ্বত্থ ও দূর্বাঘাসে—
কাল সেথা ছিল, এক্ষুণি এলো,
প্রিয়া রাশ্যার শ্লেষ্মা কাশে···

আকাশের মাথা ড্যাকোটা মুড়োয়,
স্কাই মাস্টার, ধারালো ক্ষুরে ;
কোন্ দস্যির নস্যি গুঁড়োয়
হাঁচি ভাব গজাননের শুঁড়ে ?—
সভা সংসদে ভাঙা চিৎকার,
গণেশ ঠাকুর বেজায় কুঁড়ে···

মধ্যদিনে

সেবার জষ্ঠি মাসে প্রচণ্ড গরম ··মধ্যদিনে আকাশ সংহাররূপ ধারণ করেছে। সূর্যের খর তাপে বাইরে বেরোবার ইচ্ছে করে না। যে যেখানে আছে প্রত্যেকেরই নিস্তেজ ও নির্জীব অবস্থা।··· যেন আগুনের বর্ষা হচ্ছে আকাশ থেকে।

কোলকাতায় একটা বাড়ীর দোতলায় দোর জানালা সব বন্ধ করে একলা বসে আছি। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছি,—তন্দ্রা এসে গিয়েছে দু'চোখ ভরে। এমন সময় হঠাৎ দোর খুলে এলেন আমার কাব্যলক্ষ্মী···

ট্রামের বাসের ঝনঝনানি প্রচুর বারান্দাতে ;
বৌ-বাজারের বাড়ীর বারান্দাতে,
ফিসফিসিয়ে চুপে চুপে বলা—
শিখের হোটেল, পথের ওপর এঁটো কলাপাতে,
দুটো তিনটে খাদ্যলুব্ধ কুকুর—
ট্রাম লাইনের আশে পাশে গলা পিচের দলা,
সীতার মত, অগ্নিকুণ্ডে দুপুর···

ঘন রং-এর নেশায় মাতাল কৃষ্ণচূড়া শাড়ী,
কয়লা চুলির গনগনে ভাব-জ্যোৎস্না মুখের ওপর—
একটা বড়ো জলের ফোঁটা, মাথায় ছায়ার টোপর,
দাগ কেটে যায় অধর পথে তাজমহলী চালে···
দুপুর বেলার ধুকুচিতে বৌ-বাজারের বাড়ী,
তার ওপরে, তুমি আমি দুটো ধূপের ডেলা,
ঝনঝনানি ট্রামের বাসের, জলের ফোঁটা গালে,
আগুন সমুদ্দুরের বুকে মধ্যদিনের ভেলা···

সাদাকালোয় তিনটে কুকুর কলার পাতায় জ্বলে,
কৃষ্ণচূড়া শাড়ীর নিচে জ্বলছো বুঝি নিজে···
পিঠের ওপর এলানো চুল, ভিজে ধোঁয়ার মত,
একটা ফোঁটা চোখের জলে দুপুর গেছে ভিজে—
কি কথা যে শোনাতে চাও, গুনগুনিয়ে অতো—
খবরদারী ট্রামের বাসের, যায় না কানে শোনা ;
নীল আকাশের চোখে মুখে চাউনি থতোমতো···

জষ্ঠিমাসের স্তব্ধ দুপুর, কপোত কূজন মাখা,
রুদ্ধ দুয়ার শয়ন ঘরের ঘন ছায়ায় ঢাকা,
তুমি বুঝি স্তব্ধ দুপুর, পথ গিয়েছো ভুলে,
ভেসে এলে আমার কাছে, বৌ-বাজারের কূলে—
এখানেতে শব্দ অনেক, জব্দ হলে বেজায়,
স্তব্ধ দুপুর, তাইতে বুঝি গালে জলের ফোঁটা,
মোর দুপুরের ঝনঝনানি শ্রাবণ মেঘে ভেজায় ?

এখানেতে আর এক ছবি, বাইরে বারান্দাতে—
যতটা দূর দৃষ্টি চলে, আগুন জ্বলে ধুধু,
রেলিং-হেলা স্তব্ধ দুপুর, শব্দ দুপুর নিচে,
ট্রামের বাসের নূপুর বাজায়, পথের গলা পিচে—
পায়ের তলায় তলায় যত ছায়ানটীর সাথে,
খুব জমেছে, গাছের বুকে টেনে নেবার খেলা—
আগুন সমুদ্দুরের বুকে মধ্যদিনের ভেলা···

এতোটুকু

অখণ্ড ও বিরাটকে ছোট ছোট টুকরো টুকরো করে দেখতে মানুষের কতো না ইচ্ছে! অথচ মানুষ কতোটুকুই বা জানে, কতোটুকু উপলব্ধি করতে পারে?···

এতোটুকু জানি, তবুও ভাবি সবটা নিয়ে নিয়েছি মুঠোর মধ্যে, সমস্ত ধূলিকণার মধ্যে নিজেকেই দেখতে পাই সব সময়। মনে হয় সবটাই আমার, সবটাই আমি চিনি।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই এগিয়ে চলেছি পথের ওপর দিয়ে। সব সময় স্বপ্নই দেখছি শুধু···

ভালোবাসি, ভালোবাসি, শুধু এই কথাটাই জপ করছি ঘুমের মধ্যে···

শুধু এতোটুকু জানি,
তবু তাকে কত বড়ো করে,
কত না বিরাট বলে মানি···
এতোটুকু, তবু শুধু ভুল,
ছড়িয়ে রয়েছে ফিকে ফিকে,
কত গাছ, কত লতা, ফুল—
ঘন ঘন, কত দিকে দিকে,
চোখে চোখে চপল ইশারা,
রাত্রির আকাশ ভরা ঐ
কিছু কিছু মনে পড়া তারা···

এখানে ওখানে প'ড়ে
সই করা ছড়ানো কাগজ,
না জানা নামের সই করা—
সারাপথে চিঠি ছড়াছড়ি,
ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি,
শুধু এই কথা দিয়ে ভরা···
সুমুখে পিছনে শুধু ঐ
ছলছল ছলছল ঢেউ,
···ঠোঁটকাঁপা কথা, ভালোবাসি···
ফিসফিস, পাছে শোনে কেউ···

পায়ের সুমুখে আছে,
অসীম সে অতল সাগর,
তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে
নীল চোখ একটা ডাগর…
কার তরে আছে তুলে রাখা,
আর একটা নিদহারা চোখ ?
দিনের বেলায় শুধু আসে,
থেকে থেকে ঢুলুনির ঝোঁক—
একটা চুমুকে আজো বাকী,
ভালো করে আর একটা ঢোঁক…

তবু তো এগিয়ে চলি,
মনে ভাবি সবাইকে জানি,
জনে জনে সেই শুধু বলি—
দু'চারটে কথা মনে থাকে,
তাও থেকে থেকে ভুলে রই,
-গুনগুন দু'একটা কলি,
দু'একটা মুখ থইথই…
দু'একটা মুখ, তাও ভুল,
তবু ভাবি সবাইকে চিনি,
সব পাখী, সব তারা, ফুল…

আমার ঘুমের কথা,
ওরা তো বোঝে না কেউ মোটে ;
এতোটুকু, তবু তার পাশে,
অগুনতি আমি এসে জোটে…
সারা পথে গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো,
সবগুলো আমার স্বপন,
ঘুমে ঘুমে রং মাখামাখি,
মরসুমী ফুলের মতন—
তাই সব বিরাট বিপুল,
নখে জ্বলে অসীম আকাশ,
তাই ভাবি সবাইকে জানি,
সব ফুল, সব পাতা, ঘাস··

ক্ষতফল

পেশোয়ারে জানুয়ারী মাসের কনকনে শীতের রাত্রি। একটি পরিবারের সকলে একত্র হয়ে মধ্যিখানে একটা লোহার পাত পেটা চতুষ্কোণ আধার নিয়ে আগুন পোয়াচ্ছেন। এঁদের সঙ্গে একজন কবি সম্প্রতি খুব অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন।

সাংসারিক কাজের তাগাদায় হঠাৎ এক সময় অন্য সকলে উঠে গেলেন আগুনের কাছ ছেড়ে। রইলেন শুধু এক দিকে কবি ও অন্য দিকে একজন তরুণী। মধ্যে রইল আগুন।..

সময় বুঝে মেয়েটি অনুযোগ জানালো কবিকে: আপনি কত লোকের জন্যে কত সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখে দিয়েছেন, শুধু আমিই বাদ পড়ে গেলাম।

কবি বল্লেন, এক্ষুণি কবিতা দিতে পারি আপনাকে, যদি একটা শর্তে রাজী হন। আপনি কল্পনা করে নিন, আপনি ওপারে বসে আছেন সীতা, আর আমি এপারে রাবণ বসে আছি —মধ্যিখানে ঐ যে আগুন, ওটা লঙ্কার চিতা জ্বলছে।

তরুণী চোখ নিচু করে বললে, বড়ো বেশী দাম চাইছেন আপনি।

কবি হেসে বললেন, বেশী নয়—একেবারেই বেশী নয়। ভেবে দেখবেন, মেয়েদের কাছে এর চেয়ে কম দাম কোন পুরুষ চাইতে পারে না। রাবণ সীতাকে চুরি করে এনেছিল বটে, তবে তারপরে সমস্ত রামায়ণে সীতার দেহকে নিয়ে একটাও কথা নেই কোনখানে। রাবণ সীতার মন পাবার চেষ্টাই করেছিল অবিশ্রাম।

তারপর রাবণ বলছে···

ঝংকারি' ওঠে শিশির রাত্রি,
জ্বলে লঙ্কার চিতা,
এই পারে বসি মত্ত রাবণ,
ওপারেতে তুমি সীতা—
আগুন পোহাও, কনকনে রাতি,
উষ্ণতা-সচকিতা···

রাজার দুলালী, মিথিলা দেশের
মাটির গর্ভে থাকি,
বিদেহেতে তুমি কোথা পেলে দেহ?
ও শুধু মাটির ফাঁকি—
ফুটি-ফুটি দিনে অগ্নি শৈল
বুকে ফুটেছিল নাকি?···

আগুন পোহাও রাজার দুলালী,
আমার লঙ্কা জ্বলে—
ঝলে অনলের মায়ারঞ্জন,
তব মুখ-উৎপলে;
শিশির রাত্রি, এপারে ওপারে
অনল-ঝঞ্ঝা চলে···

গণ্ডি মানোনি দণ্ডক বনে
ভিক্ষা দেবার লাগি ;
কত প্রতীক্ষা···তারপর নিলে,
স্বর্ণলঙ্কা মাগি—
সেদিন প্রভাতে ভিক্ষার ফল
বহু ক্ষতে ছিল দাগী···

তুমি তো জানো না মোর প্রাণপণ,
মত্ত প্রয়াস কত ;
হিসাবের পাতা আজ দেখে নাও,
নয়ন কোরো না নত—
আজ বোঝা যাক, কে দিল ভিক্ষা,
পাকা ভিখারীর মত···

বিদেহের মেয়ে, কোথা ছিল দেহ,
যার এত কলরব ?
তুমি চেয়েছিলে, আমি দিয়েছিনু
দেহাতীত বৈভব—
শুধু কি আগুন ছাই করে দেয় ?
ছাই আগুনেরো শব···

মরেছে রাবণ, আজো কানে কানে,
ধুধু তার চিতা জ্বলে,
রক্তগোলাপে, অশোকে পলাশে,
উদয়অস্তাচলে—
তোমার অধরে পাকা কামরাঙ্গা
সেই অনলেতে গলে···

কুড়ানো মেয়েকে রাজর্ষি নিলো
আপন দুহিতা করি,
তারপর, বীর রাজার কুমার,
নিলো বধূত্বে বরি—
তারপর, এলো মত্ত রাবণ,
শেষ হ'ল শর্বরী···

মহিমোজ্জ্বল উদয় অচলে
তোমারে বসানু সীতা,
কি তুমি চেয়েছো, কেন ও প্রশ্ন ?
ঐ জ্বলে মোর চিতা···
আগুন পোহাও, কনকনে রাতি,
উষ্ণতা-সচকিতা।

আমার কবিতা

যে পুরোনো হয়ে গেছে, তার তারুণ্য কিছু আবার নতুন করে ফিরে আসে না। তবু, যাকে ভালোবাসি, তাকে নতুন করে সাজিয়ে গুজিয়ে, নতুন একটা কাল্পনিক পরিবেশের মধ্যে পাবার ইচ্ছে আমাদের সকলের মনেই লুকিয়ে থাকে। সেই রকম একটা করুণ প্রয়াস রূপ ধরেছে এই কবিতাটার ভেতরে...

লিখিতে বসেছি আমার কবিতা বাদলের সাঁঝে আজি,
সুমুখে ভৃত্য রয়েছে দাঁড়ায়ে গাঁজার কলিকা সাজি ;
টেবিলের 'পরে রাখা আছে আর,
অর্ধবোতল দ্রাক্ষার সার—
ও সব না হলে মোটেই আমার কবিতা ওঠেনা বাজি'—
লিখিতে বসেছি আমার কবিতা বাদলের সাঁঝে আজি।

বিক্রমাদিত্য রাজার আমলে গাঁজার দমেরই জোরে,
কালিদাস তার মেঘদূতখানা লিখেছিল অতো করে ;
তোমরা বলিবে, তাহা মানিব না,
থাকুক সে কথা ; দিত কি দিত না,
ক্যালিদাস-প্রিয়া তুলে মুখফণা
কবির মুখের 'পরে—
কচি খোকা নও বোঝ তো সকলি কখন ওষুধ ধরে ॥

পদে আছি আমি, টানি মাঝে মাঝে গাঁজার কলিকা শুধু,
হাজার গাঁজার কলিকা জ্বলিছে রমণী অধরে ধুধু ;
প্রিয়া এসে যবে মুখের ওপরে,
মুখ রেখে বুকে কেঁপে কেঁপে মরে,
মেঘদূত লেখে খসখস করে
যে খায় বোতলে হুহু—
বোঝ না কিছুই, চিৎকার কর কালিদাস ব'লে শুধু ॥

বাড়ীর মধ্যে নিছক একেলা, স্তব্ধ নিঝুম রাতি,
পাশের ওঘরে, রূপসী পাচিকা রাঁধিছে জ্বালায়ে বাতি ;
সুন্দর মুখ, সুন্দর কেশ,
বেশ প্রাণপণে আঁটসাঁট বেশ,
চোখে মুখে বুকে ষোড়শীর ঠেস,
কাঁদে তিরিশের ছাতি—
পাশের ওঘরে রূপসী পাচিকা রাঁধিছে জ্বালায়ে বাতি ॥

যাব না কি ছুটে, তাহার নিকটে, অধর মধুর লাগি ;
বলিব কি তারে, হে করুণাময়ী, তোমারি করুণা মাগি ;
সুন্দর ঐ কম তনু-গাথা,
রাঁধিবার তরে গড়েনি বিধাতা ;
দাও দূরে ফেলে হাঁড়ি বেড়ি হাতা,
দূরে ফেলে দাও রাগি'—
তুমি না আসিলে, হে মোর কবিতা, কবিতা উঠে না জাগি ॥

ঝরঝর ঐ ঝরিতেছে বারি, আকাশে চমকে আলো,
হাজারি বেটা তো বাজারে গিয়েছে, সুবিধা হয়েছে ভালো ;
থর কম্পিত হৃদয়ের 'পরে,
এই বেলা বঁধু এসো তুমি সরে,
এ মোর আঁধার বুকখানা ভরে'
তোমার প্রদীপ জ্বালো—
নিভে যাক আজ আকাশের চাঁদ, নিভে যাক সব আলো ॥

কুলবধূ তুমি, নহ দ্বিচারিণী, লজ্জা লাগিছে নাকি ?
পঞ্চসতীর পিত্ত গলিল, আর কি রহিল বাকি !
শোন রসময়ী, ওটা খাঁটী ধেনো—
এও বলি তবে, হইবে না কেন ?
এ হেন যুবতী, রূপসী এ হেন,
কিছুতে পড়েনা ফাঁকি—
বিধি বেছে বেছে নিখিলের মধু তারি কাছে যায় রাখি ॥

লজ্জা লাগিছে, কুলবধূ তুমি, একি কথা আজ শুনি ?
তোমারো এতোটা সেকেলে ধরণ, তুমি কি গো ঋষি মুণি ?
সকল সময় স্বামীকেই চাই,
একি অদ্ভুত কথা শুনি ভাই ?
আমাদের নাই ওসব বালাই,
এটা ওটা ইনি উনি—
কি এমন দামী, বিবাহিত স্বামী, তাকে এত টানাটুনি !

বিবাহ করেছে যে জন তোমায়, সে জন তোমার স্বামী,
এতো ভালোবাসি পরাণ ভরিয়া, কেহ নহি বুঝি আমি ?
মাসহারা দিয়ে রেখেছি তোমারে,
মনে ভাব বুঝি শুধু রাঁধিবারে ?
রয়েছে বাঁচিয়া এখনো এ হাড়ে,
রসিক পুরুষ দামী—
ভগবানে আমি তালাক দিয়েছি, পালাক তোমার স্বামী ॥

শোন কথা রানী, হাজারি আসবে, সময় মোটেই নাই,
প্রেম আর টাকা, তুই ধ'রে পাখা, এক নিমেষেই ভাই ;
যাবে দিন মাস হাজারে হাজারে,
আবার হাজারি যাবে না বাজারে,
এমন মধুর সিক্ত আধারে
থুয়ে রেখে এক ঠাঁই—
তুজনার এই নির্জন রাতি মিছে পুড়ে হবে ছাই !

* * *

এসেছে হাজারি, ঐ কড়া নাড়ে, আর কেন মিছে ছল ?
যাক উড়ে যাক, এক ফুৎকারে, স্বপন তাজমহল ;
আসলে, পাচিকা পরকীয়া নহে,
মোরে নিশিদিন কোলে ক'রে রহে,
বিবাহ করেছি, মিলনে বিরহে
ঐ শুধু সম্বল—
একঘেয়ে জ্বরে পচে গেছে মুখ, তাই এই অম্বল ॥

জলের গেলাস নেড়ে নেড়ে যদি শরবত বলে খাই,
টাইম-টেব্‌ল্‌ বইখানা খুলে যদি আমেরিকা যাই ;
স্বকীয়াকে যদি পরকীয়া ভাবি,
চল্লিশে করি সতেরোকে দাবি ;
খাবি খেতে খেতে যদি মৃগনাভি,
পেটে পেকে ওঠে ভাই—
কেন রাগ করো, হাততালি দিয়ে, বলো তাই, তাই, তাই ॥

